বিবেকানন্দ মিশন মহাবিদ্যালয়

Vivekananda Mission
Mahavidyalaya

স্নাতকোত্তর শ্রেনী
বাংলা বিভাগ
২০২২-২০২৩

রেজিস্ট্রেশন নং ঃ ১১৬০০৯১, সাল ঃ ২০১৮-২০১৯
রোল ঃ PG/VUEGS54/BNG-IIIS, নং- ০১১

বিশেষ পত্র

পাঠকলা ঃ বি. এন. জি. - ৩০৫

-ঃ বিষয় ঃ-

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'চোখের বালি' উপন্যাসে প্রেমমনস্তত্ত্ব

তত্ত্বাবধায়ক ঃ ড. ছবি সরকার,
ড. অশিস অধিকারী

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'চোখের বালি' উপন্যাসে প্রেম মনস্তত্ত্ব।

বিষয়: রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'চোখের বালি' উপন্যাসে প্রেম মনস্তত্ত্ব।

স্বাক্ষর: জয়শ্রী মণ্ডল

তারিখ: 07.02.2023

তত্ত্বাবধায়কের স্বাক্ষর:

তারিখ: 22.03.2023

স্থান : বিবেকানন্দ মিশন মহাবিদ্যালয়

প্রস্তাবনা:-

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ছিলেন বাঙালি কবি, উপন্যাসিক, সংগীত স্রষ্টা, নাট্যকার, চিত্রকর, ছোট গল্প, প্রাবন্ধিক, দার্শনিক। রবীন্দ্রনাথকে 'গুরুদেব' কবিগুর 'বিশ্বকবি' অভিধায় ভূষিত করা হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর অন্যতম উপন্যাস 'চোখের বালি'। উপন্যাসের বিষয়" সমাজ ও যুগ যুগান্তরাগত সংস্কারের সঙ্গে ব্যক্তি জীবনের বিরোধ"। উপন্যাসে এক অনভিজ্ঞা বালিকা বধূ, একবাল্য বিধবা ও তার প্রতি আকৃষ্ট দুই পুরুষকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়েছে।

আমার এই বিশেষ পত্রটি নির্বাচনের জন্য আমি আমাদের বিভাগীয় অধ্যাপিকা ড. ছবি সরকার এবং অধ্যাপক ড. আশিস অধিকারী অধিকারী এনাদের যথেষ্ঠ সাহায্য পেয়েছি। এছাড়াও ও বিভাগীয় অন্যান্য অধ্যাপক ও অধ্যাপিকা গন আমাকে অনেক সাহায্য করেছেন। তাই আমি সমস্ত সম্মানীয় ব্যক্তিবর্গের কাছে আমার বিনয় শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। এছাড়াও অনেকে সহপাঠী আমাকে যেমন উৎসাহ দিয়েছে তেমনি গ্রন্থাগারিক ও বই এগিয়ে দিতে সাহায্য করেছেন। তাই আমি তাদের কাছে আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

সূচিপত্র

ক্রমিক নম্বর	বিষয়।	পৃষ্ঠা সংখ্যা
১।	ভূমিকা	১-৩
২।	রবীন্দ্র উপন্যাসের প্রেম	৪-৯
৩।	'চোখের বালি'উপন্যাসে প্রেম ভাবনা	১০-১৪
৪।	উপসংহার	১৫
৫।	তথ্যসূত্র	১৬
৬।	সহায়ক গ্রন্থ	১৭

ভূমিকা:-

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'চোখের বালি' বাংলা সাহিত্যের প্রথম মনস্তাত্ত্বিক উপন্যাস। 'চোখের বালি' উপন্যাসের মধ্য দিয়ে বাংলা উপন্যাসের পালাবদল ঘটেছে। চোখের বালি উপন্যাসের প্রধান চরিত্র ও সমস্যা বিনোদিনীর প্রেম। উপন্যাসের প্রথম শব্দটি বিনোদিনী উপন্যাসের শেষ পর্যন্ত বিনোদিনী চরিত্র উচ্চকিত। ১৯০০ খ্রিস্টাব্দে বিনোদিনী নামে একটি লেখা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের খসড়া আকারে শেষ করেন। বিনোদিনী নামে নামের এ খসরাটির নাম প্রদানের ক্ষেত্রে চোখের বালি মনস্তাত্ত্বিক নাম উপন্যাস আকারে প্রকাশিত হয়।

সামাজিক উপন্যাসে যেমন মনস্তাত্ত্বিক উপন্যাসেও সামাজিক ঘাত-প্রতিঘাত থাকতে পারে। মনস্তাত্ত্বিক উপন্যাসে কাহিনী অবলম্বন মাত্র প্রকৃত উদ্দেশ্য থাকে মানব মনের জটিল দিকগুলো সার্থক বিশ্লেষণের মাধ্যমে উপস্থাপনা করা। বিশ্ব সাহিত্যের রুশ লেখক লিখিত ক্রাইম এন্ড পানিশমেন্ট এবং বাংলা সাহিত্যের রবীন্দ্রনাথের 'চোখের বালি' ,চতুরঙ্গ, ,সৈয়দ উল্লাহর, 'চাঁদের অমাবস্যা, 'কাঁদো নদী কাঁদো' মনস্তাত্ত্বিক উপন্যাসের উজ্জ্বল উদ্ধারণ। আখ্যান ভাগ অপেক্ষা চরিত্র চিত্রায়ন মূল্যবান হয়ে ওঠাকে মনস্তাত্ত্বিক উপন্যাস বলে।

এই উপন্যাসটি বাংলা উপন্যাস সাহিত্যের সম্পূর্ণ নতুন একটি ধারার জন্ম দিয়েছিল। এর আগে পর্যন্ত বাংলা উপন্যাসে সাহিত্য প্রবল ভাবে ছিল বঙ্কিম স্বর্ণযুগ। স্বাভাবিকভাবে বঙ্কিমের ধারা গভীরভাবে প্রভাবিত করেছিলেন করেছিলেন। বঙ্গদর্শন পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়েছিল 'বিষবৃক্ষ,। সেই সময় ওই উপন্যাসটি গভীরভাবে আলোড়িত করেছিল সব বাঙালি পাঠকের মনে। বেশ কয়েক বছর বাদে নবপর্যায়ের বঙ্গদর্শনীর সম্পাদনার দায়িত্ব এসে পড়ে রবীন্দ্রনাথের উবলে

এর আগে পর্যন্ত বাংলা উপন্যাস সাহিত্যে প্রবল ভাবে ছিল বঙ্কিমের স্বর্ণযুগ। স্বাভাবিকভাবে বঙ্কিমের দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

বঙ্গদর্শন পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়েছিল,'বিষবৃক্ষ,। সেই সময় ওই উপন্যাসটি গভীরভাবে আলোড়িত করেছিল সব বাঙালি পাঠকের মনে, বেশ কয়েক বছর বাদে নবপর্যায়ে বঙ্গ দর্শনের সম্পাদনা দায়িত্ব এসে পড়ে রবীন্দ্রনাথের উপর।

গোড়ার দিকে রবীন্দ্রনাথ বেশ সংকুচিত হয়ে পড়েছিলেন নতুন এই দায়িত্বভার পেয়ে। ভালো সম্পাদক এবং ভালো লেখক সব সময় নতুন কিছু করতে চান। নতুন পত্রিকায় অত্যন্ত সচেতন ভাবে রবীন্দ্রনাথ লিখতে শুরু করলেন 'চোখের বালি,। উপন্যাসের সংলাপের মধ্যে বিষ বৃক্ষ উপন্যাসের কোথা আছে। বোঝা যায় বিষবৃক্ষ উপন্যাসের কথা ভুলতে পারেনি লেখক। এবং সম্ভবত প্রতিমুহূর্তেই সচেতন ছিলেন যে ওই উপন্যাসের মায়াজাল ছিন্ন করে তাকে নতুন কিছু লিখতে হবে। তিনি তা পেরও ছিলেন, বাংলা সাহিত্যে শুরু হয়েছিল 'বিষবৃক্ষ' অতিক্রান্ত করে শুরু করেছিলেন 'চোখের বালি' যুগ।

চোখের বাড়ির সূচনা অংশে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন ''সাহিত্যের আধুনিক পর্যায়ের পদ্ধতি হল ঘটনা পরম্পরায় বিবরণ দেওয়া নয়, চরিত্রকে বিশ্লেষণ করে বের করে দেখানো। সামাজিক ঐতিহাসিক উপন্যাসের মতো মনস্তাত্ত্বিক উপন্যাসের নির্দিষ্ট কোন শ্রেণী আজও স্বীকার করা হয়নি, চিহ্নিত করে দেয়া হয় না, এগুলি শুধুমাত্র মনস্তাত্ত্বিক উপন্যাস এ কারণে মনে করা যেতে পারে মনস্তত্ব ছাড়া উপন্যাস হয় না।

কিন্তু সমস্ত উপন্যাস এই মনস্তাত্ত্বিক ধারণা করা যায় না। সামাজিক উপন্যাস যেমন সমাজ চরিত্রকে তার নিজের দিকে টানছে ঐতিহাসিক উপন্যাস ইতিহাস যেমন উপন্যাসের চরিত্র ও পরিণতিকে তার নিজের দিকে টানছে তেমনি এমন কিছু উপন্যাস আছে সেখানে উপন্যাসের সমাজ ও বাইরের পট থেকে চরিত্রগুলিকে মানব মনের গোপন রহস্যের দিকে টানছে।

উপন্যাসের শুরুতেই গল্পের নায়ক মহেন্দ্র ও তার মা রাজলক্ষ্মী কথোপকথনের মাধ্যমে তার মায়ের ছোটবেলার বান্ধবী হরিমতির মেয়ে বিনোদিনীকে পুত্রবধূ হিসেবে ঘরে তুলতে চায়। কিন্তু মাতৃস্নেহ হারানোর দোহাই দিয়ে সে প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে। মায়ের প্রতি ছেলের ভালবাসায় সিক্ত হয়ে এ বিষয়ে বেশিদূর এগোতে পারেনি। অবশেষে অন্যত্র বিয়ে হল বিনোদিনীর এবং কিছুদিন পর বিধবা হতে হল।

তিন বছর পর, মা এবার তার ছেলের বিয়ের জন্য উঠে পড়ে লেগেছে। এবারও মহেন্দ্র পুরনো অজুহাত দেখায়। ওদিকে মহেন্দ্রর কাকি অন্নপূর্ণা দেবী স্বামী সন্তানহীন, মহেন্দ্র কে নিজের সন্তানের মত ভালবাসে। অন্নপূর্ণার পিতৃমাতৃহীনা এক বোনজি আশালতার সাথে মহেন্দ্রর বিয়ের ইচ্ছা থাকলেও বলতে পারেনা। মহেন্দ্র এ ব্যাপারটি ঠিকই অনুধাবন করত।

অবশেষে মহেন্দ্রর চেস্টায় তারই বন্ধু বিহারী সাথে বিয়ে ঠিক করে মেয়ের দেখার জন্য কাকিকে প্রস্তাব করে। বিহারী মহেন্দ্রর বন্ধু হলেও মা কাকি স্নেহের পাত্র ছিল। আশালতাকে দেখতে গিয়ে নিজেই মনস্থির করে এবং শেষ পর্যন্ত নানা বাঁধার পর নিজেই আশাল তাকে বিয়ে করে। শুরু হয় মহেন্দ্রর নতুন জীবন। সমাজ সংস্কার কে পেছনে ফেলে এগিয়ে যেতে থাকে দুজনের প্রণয় লীলা। দিন দিন ছেলের ওপর থেকে অধিকার হারাতে থাকে রাজলক্ষ্মী দেবী। এইসব নিয়েই অন্নপূর্ণা ও রাজলক্ষ্মীর মধ্যে মনমালিন্য শুরু হয়। ফলাফল স্বরুপ, অন্নপূর্ণা বাড়ি ছেড়ে কাশিতে চলে যায় ধর্ম পালনের দোহাই দিয়ে। মায়ের ওপর ছেলের ভালবাসা পরীক্ষা করতে রাজলক্ষ্মী গ্রামের বাড়ি চলে যায়। ফিরে আসার সময় সঙ্গে নিয়ে আসে অল্প দিনের মধ্যে আপন করে, নিজের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়। আশালতার সঙ্গে বিনোদিনীর সখী স্থাপনের মাধ্যমে মহেন্দ্র সাথে পরিচিত হয় এবং তাকে আকৃষ্ট করতে সক্ষম হয়।

ঘটনার ক্রম গতিতে মহেন্দ্র গোপনে বিনোদিনী সঙ্গে প্রেমে অনুরক্ত হয়ে পড়ে। এরি মাঝে বিহারী মাঝে মাঝে মধ্যে উপস্থিত হয়ে কখনো কটাক্ষের বানে বিদ্ধ করতে চেয়েছে। আবার কখনো মর্তবাসিনী দেবী বলে শ্রদ্ধা ভক্তি দেখিয়েছেন। মহেন্দ্র বিনোদিনীর গোপন আকর্ষণের মধ্যে, বিনোদিনী বুঝতে পারে বিহারীর প্রতি গভীর ভালোবাসা অনুভব করতে পারে। কিন্তু মানুষের চাওয়া পাওয়ার সাথে প্রাপ্তির মেলবন্ধন সব সময় হয়ে ওঠেনা। ভুল বোঝাবুঝিতে বিনোদিনীর ভালোবাসা প্রত্যাখ্যান করে বিহারী। বিহারী প্রত্যাখ্যান বিনোদিনীকে প্রতিহিংসায় পরিণত করে। সম্ভাব্য দুর্যোগ থেকে আশারতাকে বাঁচানোর আপ্রাণ চেষ্টা করে এবং মহেন্দ্রর মুখে আসার প্রতি বিহারীর দুর্বলতার প্রসঙ্গ শুনে বিনোদিনী সরল আশালতার সংসার জ্বালিয়ে দেওয়ার জন্য উধ্যত হয়। উপায় না পেয়ে মহেন্দ্রর সাথে মিথ্যা ভালোবাসা অভিনয়কে তীব্র করে তুলেছে।

এইভাবেই কৃপণ প্রেমের এই সমীকরণ ক্রমশই জটিল আকার ধারণ করতে থাকলো। স্নেহ ভালবাসার পরিবারটি ঝড়ের মতো ভাঙতে লাগলো। শেষ পর্যন্ত বিহারী বিনোদিনীকে বিবাহ করতে চাইলে বিনোদিনী প্রত্যাখ্যান করে। আর মহেন্দ্র তার সন্তান সম্ভাবনা স্ত্রীর কাছে চলে যায়। বিনোদিনী দেশ উদ্ধারের সংগ্রামে চলে যায়।

রবীন্দ্র উপন্যাসে প্রেম:-

রবীন্দ্র উপন্যাসে প্রেম সমস্যা নরনারীর চিরন্তন হৃদয়কে ফুটিয়ে তুলেছে। লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে নর-নারীর হৃদয় দন্দ ও পারস্পারিক সংঘাতের নামান্তর যে প্রেম সমস্যা তাই রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসে মৌল সমস্যা। এক্ষেত্রে বঙ্কিমচন্দ্রের মতো রবীন্দ্রনাথের মধ্যেও প্রেম সম্পর্কে এক বিশিষ্ট ধারণার পরিচয় পায়। কিভাবে এই ধারণা তার উপন্যাস ধারার বিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে বিকাশ ও পরিণতি লাভ করেছে।

বুদ্ধদেব বসু রবীন্দ্রনাথের প্রেমের কবিতা সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে বলেছেন- "রবীন্দ্রনাথের জন্মে রুচিতে, শিক্ষায়, পরিপূর্ণ তার মন অতিরিক্ত রকম আধ্যাত্মিক", রবীন্দ্র দৃষ্টিতে প্রেম প্রিয়ার হৃদয়কে খুঁজে ফিরেছে। পিয়ার মধ্যে যে অবচেতন মন আছে তার সন্ধান কবি না পেলে কোভিদ হৃদয় তৃপ্তি হয় না। সেই প্রেমের অভিযাত্রার মাঝে কবি যাকে জীবনসঙ্গী হিসেবে পেয়ে যান। সে তো তার জীবন সঙ্গিনী নয়; তাকে মনে হয় তপশিনি। কোভিদ মনে সর্বদাই সংশয়, বুঝি তার প্রেম প্রিয়ার হৃদয়ে ব্যথা এনে দেয়, প্রেমের জুতা মূল্য দিতে কবি ব্যর্থ হয়ে যান না। এই আশঙ্কার যে হৃদয় দ্বন্দ্ব সেই দ্বন্দ্ব থেকেই প্রিয়াকে প্রেম নিবেদন করতেও দ্বিধা আসে না তাঁর। প্রসঙ্গে বুদ্ধদেব বসুর মতোই বলা হয়:

"যে পুরুষ নারীকে তার দায়িত্বের, তার দুঃখের, তার অপমানের সমান অংশ দিতে চায়না, তাকে শুধু ভালোবাসা খেলার পুতুল সাজিয়ে রাখতে চাই, সে দুর্বল, সে কাপুরুষ, তারই বিরুদ্ধে আধুনিক নারীর বিদ্রোহ, রবীন্দ্রনাথ তার প্রেমের ভিত্তি স্থাপন করতে, তিনি চান দুজনে মিলে পৃথিবীর মুখোমুখি দাঁড়াতে, সব দুঃখ একসঙ্গে মাথা পেতে নিতে, সব দায়িত্ব একসঙ্গে বহন করতে করতে"।

প্রিয়া যদি কখনো বিমুখ হন তাতে কোভিদ দুঃখ পাবার কিছুই নেই, কারণ কবি বিশ্বাস করেন প্রিয়ার এই বিমুখতা ক্ষণকালের।

মহুয়া কাব্যে তিনি বলেছেন-

"ফেরালে মোরে মুখ!

এ শুধু মোর ভাগ্য করে মুণিক কৌতুক

তোমার প্রেমে আমার অধিকার

অতীত যুগ হ'তে সে যেন নিখন বিধাতার লিখন বিধাতার"।

প্রিয়ার ওপর কবির যে আত্মবিশ্বাস তাকে তিনি কখনো নষ্ট হতে দিতে চান না। প্রেমের অধিকার কে কবি কোন কৃত্রিম বাঁধনে বাঁধতেও অপ্রস্তুত।" তার প্রেমে মুক্ত, সচ্ছন্দ বিহারী, নিজের মহিমায় প্রতিষ্ঠিত, প্রেম যখন মরবে, তখন তিনি তাকে অনা অনায়াসে ছেড়ে দেবেন, তখনো তাকে ধরে, রাখবার ব্যঙ্গ করে এবং হাস্যকর করার চেষ্টা তিনি কখনোই করবেন না"।

এ বিষয়ে শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন," যে প্রতিশ্রুতিতে প্রেমের চঞ্চল বিক্ষোভ নিরাপদ বেন্টোনির মধ্যে নিস তরঙ্গ শান্তিতে বিলীন হয়, তাহার বাস্তবিক পক্ষের তাহার পক্ষচ্ছেদ, তাহার কর্তব্য ব্যঞ্জনে আত্মসমর্পণ"। তাই সমগ্র রবীন্দ্র সাহিত্য সীমার সঙ্গে অসীমের মিলন সাধনের প্রয়াস। প্রেমের ক্ষেত্রে ও আছে সীমা ও অসীমের ভাবনা। রবীন্দ্র দৃষ্টিতে প্রেমকে সীমার বন্ধনে বাঁধতে যাওয়ার চেষ্টা বৃথা, কারণ যথার্থ প্রেম কখনো সীমার বাঁধনে বাধা পড়ে না, সে অসীম মানব মানবীর জীবনে প্রেমের আবির্ভাব খুবই স্বাভাবিক, অনেক সময় এই প্রেমের পথ ধরে চলতে চলতে নর নারীর জীবনে বিবাহ আবশ্যিকভাবে এসে পড়ে। কিন্তু সব সময় বিবাহের বন্ধনে প্রেমকে পাওয়া যায় না সব সময় বিবাহের বন্ধনে প্রেমকে পাওয়া। নারীর মধ্যে প্রিয়াকেও পাওয়া যাবে, পত্নীকেও পাওয়া যাবে তা ভাবা যায়। জীবনের সমস্যা অনেক এই সমস্যার মধ্যে অবস্থান করে পুরুষের জীবন প্রিয়াকে প্রশ্ন রূপে পাওয়ার সাধনা সর্বত্র সফল হয় না।

'প্রমথ নাথ বিসি' বলেছেন-"প্রেম ও বিবাহ, দুইয়ের স্বাতন্ত্র ও স্বরূপ অক্ষুন্ন রাখিয়া সংসারে পাওয়া সম্ভব নয়, ইহাই যেন কোভিদ অভিপ্রায়।...প্রেম অসীম, কারণ প্রেম একটা মানসিক ভাব মাত্র, বিবাহ সীমাবদ্ধ, কারণ বিবাহ একটা সামাজিক সংস্কারষ মাত্র দুইয়ের সম্পূর্ণ মিলন সম্ভব নয়।.. প্রেম প্রেম ও বিবাহ লইয়া মানব জীবনের প্রধান অংশ গঠিত, সেখানে সীমা ও অসীম বস্তু যদি প্রযোজ্য না হয়, তবে সেই পরিমাণে তাহার মূল্য কমিয়া আসে, আমিয়া আসুক আর নাই আসুক, উহাই রবীন্দ্র।

সাহিত্যের মূল্য তত্ত্ব"। কাব্য নাটক, ছোট গল্প এবং উপন্যাসে প্রেম সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিভঙ্গি নানাভাবে আত্মপ্রকাশ করেছে। "চোখের বালি" থেকে চতুর্থ অধ্যায় পর্যন্ত নর-নারীর হৃদয়দ্বন্দ্বের মূল উপজীব্য প্রেমকে তিনি বিভিন্ন পরিবেশের মধ্য দিয়ে উপস্থাপিত করেছেন।'বিবাহ'সম্পর্কে ও রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিভঙ্গির প্রকাশ ঘটেছে তার উপন্যাসে বঙ্কিম উপন্যাসে বিধবার প্রেম সমাজ অনুমোদিত দেয়নি।'বিষবৃক্ষ'উপন্যাসে নগেন্দ্রনাথ এর বিধবা বিবাহ করেছিলেন কিন্তু বিবাহের পর দেখা গেল এই প্রেম স্থায়ী হয়নি, বিবাহের বন্ধন দৃঢ় হয়নি। কুন্দনন্দিনী নগেন্দ্রনাথ কে চেয়েও পায়নি, সূর্যমুখী বিবাহিত জীবনকে ভেঙে তছনছ করে দিয়েছি।'কৃষ্ণকান্তের উইলে'গোবিন্দলাল বিধবা রোহিনির প্রতি আকর্ষণ শেষ পর্যন্ত বিকর্ষণে পরিণত হয়েছি। দানপত্র প্রেমের সুখ স্বর্গে অধিষ্ঠাতা ভ্রমরকে দূরে সরিয়ে দিয়েছেন, এই কারণেই রবীন্দ্রনাথ'চোখের বালি'উপন্যাসে বিধবা বিনোদিনীর প্রেমের সঙ্গে আমাদের পরিচয় স্থাপন করে বিনোদিনীকে বৈরাগ্যের মন্ত্রে দীক্ষিত করে এই মহৎ প্রেমের দৃষ্টান্ত তুলে ধরেছেন। তাই বিধবা বিনোদিনীর সঙ্গে বিহারীর বিবাহ দিলেন না। কিন্তু বিনতিনের হৃদয়ে প্রেম ব্যাকুলতাকে পরিস্ফুট করতে এতোটুকু দ্বিধা করেননি।

প্রেম সম্পর্কের রবীন্দ্র উপন্যাসে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। নর নারীর জীবনের এই মূল চাহিদা দুটি কিভাবে সমস্যার সৃষ্টি করেছে রবীন্দ্র উপন্যাসে তার পরিচয় তুলে ধরা হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ তার 'বাঁশুরি' নাটকেও প্রেম তত্ত্বকে ফুটিয়ে তুলেছিলেন।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রথম উপন্যাস 'করুণা'(১৮৭৭-৭৮)। এই উপন্যাসটি ১৬-১৭ বছরে 'রচনা করেছিলেন। 'করুণার, চার বছর বাদে লিখেছিলেন 'বউঠাকুরানীর হাট'(১৮৮৩)। তারপর 'রাজর্ষি'(১৮৮৭) 'রাজর্ষির'পরে 'চোখের বালি'(১৯০৩)।'করুনা'উপন্যাসে নেশাগ্রস্ত মহেন্দ্র বিবাহ করেছিলেন, কিন্তু সে বিবাহ তাকে সংসারে সুখ দেয়নি। তীব্র আক্ষেপের সঙ্গে মহেন্দ্র কে বলতে হয়েছে-"আমার যদি মনের মত বিবাহ হইত, গৃহস্থের মত বিনা দুঃখে সংসার করতাম"। স্ত্রীকে ভালবাসতাম। 'করুণা' উপন্যাসে মোহিনীর চিত্রটিও যেভাবে তুলে ধরা হয়েছে তাতে বঙ্কিম উপন্যাসে ছায়াপথ ঘটেছে। করুণা উপন্যাসে নরেন্দ্র ও করুণার প্রেম কাহিনী কে ও তুলে ধরেছেন। করুনাতেও আছি প্রেমা হতো নারীর আর্ত যন্ত্রণা। তাই করুণার মহেন্দ্র রজনী উপকাহিনীতে রজনীকে উপেক্ষা করে বিধবা মহীনের প্রতি মহেন্দ্রর অবৈধ প্রেম রজনীর জীবনকেও দুঃখময় করেছে।

'বউ ঠাকুরানীর হাট'উপন্যাস রবীন্দ্র ভাবনার এক নতুন ফসল। তার আগে 'সন্ধ্যা সঙ্গীত'কাব্যগ্রন্থ রচনা করেছেন রবীন্দ্রনাথ।'সন্ধ্যা কবি ভাবনার প্রকাশ ঘটেছিল 'বউ

ঠাকুরানীর হাট'উপন্যাসের সেই কবি ভাবনারই পরিচয় পাওয়া যায়। 'সন্ধ্যা সংগীত'কোভিদ হৃদয়ের সহচরকে তিনি খুঁজে বেরিয়েছেন মনে মন, কি যেন পাননি, কি যেন হারিয়েছেন তিনি।'বউ ঠাকুরানীর হাট' বিচিত্র চরিত্রের মানুষের সমাবেশ ঘটিয়েছেন কবি সেই ব্যাখ্যাকে প্রকাশ বেদনার মুখর করে তুলতে চেয়েছেন।'বউ ঠাকুরানীর হাট' বাঙালি পরিবারের জীবন কথাকেই রূপ দিয়েছে।'সন্ধ্যা সঙ্গীত'তে যে বয়স সন্ধিকালের উচ্ছ্বাস কবির মনে, যুগল প্রেমের স্বপ্ন মধুর ছবি' বউ ঠাকুরানীর হাট' উদয়াদিত্য-সুরমার প্রেমেও আছে সে যুগলপ্রেমের।'বউ ঠাকুরানীর হাটের'অবৈধ প্রেমের চিত্র বঙ্কিমচন্দ্রের 'বিষবৃক্ষ'উপন্যাসে প্রেম বঞ্চিতা হীরা কুণ্ড নন্দিনীকে বিষ প্রয়োগ হত্যা করেছে। তেমনি উদয়াদিত্যের প্রেমের প্রত্যাখ্যানি রুক্মিনীর সুরমাকে বিষ খাইয়ে হত্যা করেছে।'বউ ঠাকুরানীর হাট'উপন্যাসে মানব মনের ব্যথা বেদনা কে কবি ফুঁটিয়ে কাহিনী এবং চরিত্রের ভিড়ে পরবর্তী উপন্যাস 'রাজর্ষি' ১৮৮৭।

'রাজর্ষি'(১৮৮৭) তে মানব ধর্মকেই যে আবিষ্কার করেছেন রাজশ্রী পরদীর্ঘ 16 বছর ধরে কোন উপন্যাস প্রকাশিত হয়নি। এই দীর্ঘ সময় ধরে রবীন্দ্রনাথ ছোটগল্প রচনা করেছেন। মানুষের প্রতি ভালোবাসা দিয়ে যার প্রথম উপন্যাস 'করুনা'। ইতিহাস বাহিনীর মধ্য দিয়ে পারিবারিক জীবনচিত্র কে উপস্থাপিত করে তিনি 'বউ ঠাকুরানীর হাট' উপন্যাস প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। 'রাজর্ষি'তে সেই ভালোবাসায় মানব ধর্মের রূপান্তরিত। ছোটগল্পের মধ্য দিয়ে সেই ভালোবাসা আত্মপ্রকাশ ঘটেছিল। নষ্ট নীড়ের মতো গল্প রবীন্দ্রনাথের হাতে তৈরি। এই মনস্তাত্ত্বিক গল্প তাকে পৌঁছে দেয় 'চোখের বালি' নামক অসাধারণ উপন্যাস রচনা জগতে। আমাদের প্রতিদিনের বাস্তব থেকে উঠে এসেছে নর-নারীর প্রেম। তাদের কামনা বাসনা বিবাহ প্রেম আকর্ষণ উপন্যাসে উপস্থাপিত হয়েছে। তখন আর কাহিনীর ঘনঘটা নেই, নরনারীর প্রেম মনস্তত্ত্বো হৃদয়ে সমস্যায় একমাত্র অবলম্বন হয়ে উঠেছে, মনস্তাত্ত্বিক উপন্যাসে। প্রেমের উপন্যাস বঙ্কিমচন্দ্রের লিখেছেন 'বিষবৃক্ষ,' 'কৃষ্ণকান্তের উইল', 'চন্দ্রশেখর' উপন্যাসে প্রেম, কিন্তু কাহিনীর ঘনঘটা, ঘটনার ঘাত প্রতিঘাত ইত্যাদি কেন্দ্র করে রবীন্দ্রনাথ'খের বালি'নতুন কিছু সৃষ্টি করলেন।'চোখের বালি'থেকেই বাংলা উপন্যাসে বঙ্কিম পরবর্তী ধারা সূচনা হয়।

'চোখের বালি' শুরুতে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন-"এর পূর্বে মহাকায় গল্প সৃষ্টিতে হাত দিইনি। ছোটগল্পে উল্কা বৃষ্টি করেছি, এবারকার গল্প বানাতে হবে এ যুগের কারখানা ঘরে। শয়তানের হাতে বিষবৃক্ষ তখনো চাষ হতো,এখন হয়। তবে কিনা তার ক্ষেত্রে আলাদা, এখনকার ছবি খুব কষ্ট সাজসজ্জার অলংকার তাকে আচ্ছন্ন করে। মানব বিধাতার এই

নিয়ে এই নির্ঘুম সৃষ্টি প্রক্রিয়ার বিবরণ তার পূর্বে গল্প অবলম্বন করে বাংলা ভাষার প্রকাশ পায়নি তারপর এই পর্দার বাইরে কার সদর রাতকে ক্রমে ক্রমে দেখিয়ে দিয়েছেন 'গোঁড়া,' 'ঘরে বাইরে,' 'চতুরঙ্গ'।

বাস্তব জীবনের প্রতিফলন আছে 'চোখের বালিতে'। নর নারীর হৃদয় গত সমস্যা রুপে এখানে প্রেমের অস্তিত্বকে স্বীকার করা হয়েছে। সেই প্রেমে বাস্তবতার স্পর্শে জীবন্ত। বিবাহ মাধ্যমে সমাজে শাসনকেই মেনে নেওয়া হয়। সমাজ সব ক্ষেত্রেই নরনারীর প্রেমকে বিবাহের মধ্য দিয়ে বাঁধবার অনুমোদন দেয় না। 'চোখের বালি'তে মহেন্দ্র র সঙ্গে বিধবা বিনোদিনীর বিবাহ হলে সমাজ অনুমোদন দিত কিনা জানিনা, বিহারের সঙ্গে বিবাহ হলে হয়তো অনুমোদন দিত অথবা দিত না। মহেন্দ্র বিবাহিত, বিনোদিনীকে বিবাহ করলে তার দ্বিতীয় বিবাহ করা হতো।। কিন্তু বিধবা বিবাহ বঙ্কিমচন্দ্র মেনে না নিলেও রবীন্দ্রনাথ হয়তো নিতেন। কারণ রবীন্দ্রনাথের ছিল সংস্কার মুক্ত মন। বিনোদিনী তো বিবাহ চাইনি চেয়েছিল প্রেম। ইরশার আগুনে পুড়ছে বিনোদিনী, মহেন্দ্রর কাছ থেকে বিবাহ প্রস্তাবের প্রত্যাখ্যান, নিজেও বিবাহিত জীবনে ব্যর্থতা। বিপিনের সংসারে তার হৃদয় ধর্মের অবমাননা এবং মহেন্দ্রর সঙ্গে আসার দানপত্র প্রেমের বন্ধনে সুখনির রচনা করার বিষয়টি তার ব্যাক্তি জীবনের বঞ্চনা কে উসকে দিয়েছিল। তাই 'চোখের বালিতে' বিনোদিনী অভিনয় করেছেন সেই অভিনয় প্রেমের।

'চোখের বালি'উপন্যাসে বিনোদিনী মহেন্দ্রর প্রেম ভিক্ষা আদৌ করেনি। মহেন্দ্রকে নিয়ে, আশাকে নিয়ে সে শুধু খেলেছে, প্রেমের খেলা ঈর্ষার খেলা।

'চোখের বালি'উপন্যাসের প্রায় আড়াই বছর পরে প্রকাশিত হয়েছে 'নৌকাডুবি'(১৯০৫)। চোখের বালিতে নর-নারীর প্রেম হৃদয়ের দ্বন্দ্ব সংঘাত যেভাবে মনস্তাত্বিক জটিলতা জাল খুলে বিশ্লেষিত হয়েছে 'নৌকাডুবিতে' তা নেই। ঘটনার ঘনঘটা ও চরিত্রের ভিড়ে 'নৌকাডুবি' উপন্যাসে রবীন্দ্রনাথ মনস্তাত্বিক জটিলতার দিকটিকে যেন স্বেচ্ছাকৃতভাবে বর্জন করেছেন। 'চোখের বালি' অবৈধ প্রেম, বিধবার প্রণয় নরনারী হৃদয়ের সমস্যা বড় হয়ে উঠেছিল কিন্তু রবীন্দ্রনাথের সংস্কার মুক্ত মানবিকতা বোধ সেই হৃদয় দ্বন্দ্বকে উদার তার সঙ্গে প্রকাশ করেছেন। কিন্তু 'নৌকাডুবিতে' হৃদয় নেই।

'গোরা' উপন্যাসে গোড়া ও সুচরিতা ২ স্বতন্ত্র লোকের বাসিন্দা। প্রেম নিবেদনের বাঁধা পথ ধরে তারা পরস্পরের দিকে এগিয়ে আসে নি। ধর্মবিশ্বাস ও সামাজিক মতে

সুচরিতার সঙ্গে গোড়ার মিল ছিল না। 'গোরার'দেশ ভক্তি বাণী সচরিতাকে মুগ্ধ করেছিল।

'বিপ্র দাস'উপন্যাসে দেখা যায় বন্দনা সুধীরকে ভালোবেসে পরিত্যাগ করেছে। অশোক কে ভালোবেসেছে আকর্ষণ অনুভব করেনি। দ্বিজ দাসের প্রতি তার প্রেমের আকর্ষণ তীব্র। তবু, কেন বিব্রতাসের প্রতি বন্দনার হৃদয় দূর্বলতা এবং প্রেম নিবেদন তা ভেবে আমাদের বিস্ময়ের সীমা পরিসীমা নেই।

'চোখের বালি'উপন্যাসে প্রেম ভাবনা:-

চোখের বালি শুরুতে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন-"এর পূর্বে মহাকায় গল্প সৃষ্টিতে হাত দেন নি। ছোটগল্পে উল্কা বৃষ্টি করেছে। এবার গল্প বানাতে হবে এ যুগের কারখানা ঘরে। শয়তানের হাতে বিষবক্ষের চাষ তখনো হতো, এখনো হয়, তবে কিনা তার ক্ষেত্রে আলাদা, এখনকার ছবি খুব স্পষ্ট,সাজ সজ্জার অলংকারে তাকে আচ্ছন্ন করলে তাকে ঝাপসা করে দেওয়া হয়,আর আধুনিক স্বভাব হয় নষ্ট। তাই গল্পের আবদার যখন এড়াতে পারলুম না, তখন নামতে হলো মনের সংসারের সেই কারখানা ঘরে যেখানে আগুন আগুনের জ্বালানি হাতুড়ি পিটুনি থেকে দৃঢ় ধাতুর মূর্তি জেগে উঠতে থাকে। মানব বিধাতার এই নির্মম সৃষ্টি প্রক্রিয়ার বিবরণ তার পূর্বে গল্প অবলম্বন করে বাংলা ভাষা আর প্রকাশ পায়নি। তারপর ওই পর্দার বাইরে ক্রমে ক্রমে দেখা দিয়েছে 'গোড়া,' 'ঘরে বাইরে,' 'চতুরঙ্গ,"।

বাস্তব জীবনের প্রতিফলন আছে 'চোখের বালিতে'। নর নারী হৃদয় গত সমস্যা রুপে এখানে প্রেমের অস্তিত্বকে স্বীকার করাহয়েছে। সেই প্রেম বাস্তব তার স্পর্শে জীবন্ত। বিবাহের মধ্য দিয়ে সমাজ সংস্কার শাসন কে মেনে নেওয়া হয়। 'চোখের বালিতে' মহেন্দ্র সঙ্গে বিধবা বিনোদিনীর বিবাহ হলে সমাজ মেনুনিত কি জানিনা। বিহারীর সঙ্গে বিয়ে হলে হয়তো সমাজ মেনে নিত। বিনোদিনী তো বিবাহ চাইনি চেয়েছিল প্রেম। ঈশ্বর আগুনে পুড়ছে বিনোদিনী মহেন্দ্রর কাছ থেকে বিবাহের প্রস্তাবে প্রত্যাখ্যান,নিজেও বিবাহিত জীবনে ব্যর্থতা। বিপিনের সংসারে তার হৃদয় ধর্মের অবমাননা এবং মহেন্দ্র সঙ্গে আশার দানপত্র প্রেমের বন্ধনে সুখের ঘর করার বিষয়টি তার ব্যাক্তি জীবনের বঞ্চনাকে উসকে দিয়েছিল। তাই 'চোখের বালি' তে বিনোদিনী অভিনয় করেছে। সে অভিনয় প্রেমের, প্রেমের শিক্ষা প্রজ্জ্বলিত করে মহেন্দ্রকে আকর্ষণ করেছে, মহেন্দ্র এই অভিনয় টের পায়নি। দুরন্ত গতিতে এগিয়ে এসেছিল বিনোদিনীর দিকে। মহেন্দ্র বিনোদিনীর প্রেমে ঝাঁপ দিয়েছিলেন ঘরের স্ত্রী থাকা সত্ত্বেও। দাম্পত্য সুখের সীমা পরিসীমা ছিল না তবুও বিনোদিনীর প্রতি দুর্বল। সেই দুর্বলতা হৃদয়ের দুর্বলতা। এই দুর্বলতার হৃদয় কে চঞ্চল করেছিল। বিনোদিনীকে পাওয়ার জন্য বিহারের সঙ্গে বন্ধুত্ব কে বিষিয়ে তুলেছিল। মায়ের স্নেহ থেকে যেন বঞ্চিত হতে লাগলো। স্ত্রীর

প্রেম আকর্ষণ থেকে দূরে সরে গেছে মহেন্দ্র তবুও বিনোদিনীকে পাইনি মহেন্দ্র।'বিষবৃক্ষে'বিধবা বিবাহ আছে। 'চোখের বালি'তে প্রেম আছে জীবন্ত হয়ে, কিন্তু বিধবা বিবাহ নেই। কবি সচেতনভাবে এই বিবাহকে এড়িয়ে গেছেন। মহেন্দ্র হয়তো বিধবা বিবাহ করতেন বিনোদিনীর সমর্থন থাকলে। তখন আশালতার কি হতো জানিনা। 'চোখের বালি'তে আশালতা, বিনোদিনীর সখি ছিলেন। আশালতা কখনো ভাবতেও পারেনি তার স্বামী তার সঙ্গে এমনটা করতে পারে। বিনোদিনীকেও সে তেমন ভাবতে পারিনি। কারণ বিনোদিনী মহেন্দ্রর জন্য আশাকে সাজিয়ে দিত। আশা এক প্রকার জোড় করে বিনোদিনীর সঙ্গে মহেন্দ্র সাক্ষাৎ করিয়েছিলেন, কথোপকথন আশাকেই একদিন মহেন্দ্রর হৃদয় থেকে দূরে সরিয়ে দিয়েছে। একদিন মহেন্দ্র ছিল প্রেমের বিষয়ে খুতখুঁতে কিন্তু বিনোদিনীর মহেন্দ্রর সেই গর্ব ভেঙে দিয়েছিল। মহেন্দ্র চেয়েছিল বিনোদিনীকে বাড়ি থেকে বের করে দিতে। বিনোদিনীর উদাসীনকে সে নষ্ট করে প্রবল ভাবে আকর্ষণ করে তুলেছিল। আশা বিনোদিনীর কাছ থেকে রঙিন পাত্র ভরে ভালবাসার সাত বুঝতে শিখেছে। সেই স্বাদ একদিন বিনোদিনী নষ্ট করে দিয়েছে। সখীত্বের জোরেই বিনোদিনীর আসার কাছ থেকে সংসারের কর্তব্য টেনে নিয়েছিল। রাজলক্ষ্মী একান্ত আপন করে নিয়েছিল। বিনোদিনী নববধূর ইতিহাস মাতালের মতো পান করেছিল। আশা লতার প্রেমের কাহিনী বিনোদিনীকে আনন্দ দিলেও ঈর্ষার কারণ হয়ে উঠেছিল। বিপিন এর মৃত্যুর পর বৈধব্যই হয়েছিল তার অলংকার। প্রেম তার জীবনে উপভোগ করা হয়নি। দানপত্র সুখ ও আসেনি তাই সুখহীন এই বিনোদিনী অন্যের সুখের দগ্ধ করার জন্য এগিয়ে এসেছিল। মহেন্দ্রর কোথা সে বুঝ শুনতে ভালবাসে মহেন্দ্রর জন্য আশা কে সাজাতে ভালবাসে আশাকে দিয়ে মহেন্দর কাছে পত্র লিখিয়ে তার হৃদয়ের উচ্ছাসকে প্রকাশ করতে চাই।

'চোখের বালি'উপন্যাসে বিনোদিনী মহেন্দ্রর প্রেম ভিক্ষা আদৌ করেনি। মহেন্দ্রকে নিয়ে আশাকে নিয়ে শুধু খেলেছে প্রেমের খেলা, ঈর্ষার খেলা। মহেন্দ্রর আয়োজিত দমদমে চড়ুইভাতীতে যোগদানের দিনটিতে বিনদীনির আসল স্বরূপ উদঘটিত হয়। চড়ুইভাতীর দিনে বিহারী সঙ্গে বেশি সময় ধরে সংস্পর্শে থাকে। বিনোদিনী বিহারীকেই ভালোবাসতো। চড়ুইভাতির দিনে বিহারী বিনোদিনীর মধ্যে আরেক মূর্তি দেখতে পান। বিনোদিনীর কোমল হৃদয় বিনোদিনী কল্যাণময়ী জননী। বিহারী বুঝতে পেরেছিল বিনোদিনী বাহিরে বিলাসিনী যুবতী বটে কিন্তু ভেতরটা খুব নরম। এই চড়ুইভাতির আবার মহেন্দ্রর আকাঙ্ক্ষিত দিনকে মাটি করে দিয়েছে। মহেন্দ্র চেয়েছিল চড়ুইভাতিতে বিনোদিনীকে কাছে পেতে। বিনোদিনী আশাকে তার নতুন অনুভূতির কথা বলেছে- "আমার মনে হইতেছে, আমি যেন মরিয়া হয়ে গেছি যেন পরলোকে আসিয়াছি, এখানে

যেন আমার সমস্ত মিলিতে পারে"। যে জীবন জ্বলে উঠেছিল দুঃখময় যেন চড়ুইভাতির মিলন স্পর্শে কিছুর পাবার আশায় রোমাঞ্চিত হয়ে উঠেছে। মহেন্দ্রর প্রতি এতদিন যে ঈশ্বর অলং শিক্ষা সে বিস্তারিত করেছিল চড়ুইভাতীর দিন সেই আগুন নিভে এসেছে। চড়ুইভাতি কাটিয়ে আসার পর মহেন্দ্র আবার সংসারে ফিরেছে। বিনোদিনী আবার আগের মতো হয়ে গিয়েছিল। মধুর অভিনয়ে আসার চেয়ে মহেন্দ্রর উপর অধিকার ফলায়। মহেন্দ্র বিনোদিনীর প্রতি দুর্বলতা বিনোদিনীর গর্ব ও সুখের কারণ হয়ে উঠলেও মহেন্দ্রর কাঙালপনা বিনোদিনীর অসহ্য মনে হয়েছিল। তাই মহেন্দ্রর এই পরিবর্তনকে বিনোদিনী ঘৃণার দৃষ্টিতে দেখেছিল। মহেন্দ্রর চেয়ে বিহারীকেই বিনোদিনী তখন থেকে শ্রদ্ধার চোখে দেখতে শুরু করে। আর মহেন্দ্র তার প্রতিদিনের জীবনে সকল কাজের সকল ব্যস্ততার মাঝখানে সেবা পেতে চেয়েছিল তা যখন আশা পূর্ণ করতে পারেনি তখন বিনোদিনীর সঙ্গে তুলনায় আশাকে ছোট করত। আশা লতা মহেন্দ্রকে ভালবাসি, স্বামীর প্রতি একনিষ্ঠ প্রেমে নিজের জীবন ধন্য করে তুলতে চেয়েছিল কিন্তু বিনোদিনী সেবায় মহেন্দ্র আশার প্রতি উদাসীনতা, আশাকে দুর্বল করেছে। একদিন আশাকে চিঠি লিখে বাড়ি ছেড়ে চলে যায় মহেন্দ্র কিন্তু বিনোদিনী যাওয়ার সময় ভাবে-"ব্যাপারখানা কি! অভিমান, না রাগ, না ভয়? আমাকে দেখাইতে চান, বাসায় গিয়া তো থাকিবে তখন দেখবো"।

মহেন্দ্রর বিদায়ের আশার বিরহ কাতরতার মূল্য বিনোদিনী দিতে জানি, কিন্তু সেই আশার প্রতি বিহারীর সমবেদনা বিনোদিনীর মন থেকে বিহারীর প্রতি শ্রদ্ধা লোঘু করে আনে। কেননা যে বিহারীকে সে শ্রদ্ধার চোখে দেখতো আশার প্রতি তার ব্যাকুলতা বিনোদিনীর কাছে অসহ্য হয়ে উঠেছে। বিহারী কিন্তু বিনোদিনীর প্রতি শ্রদ্ধা কমেনি। মহেন্দ্র সঙ্গে ঘনিষ্ঠতায় বিহার ী যে বিনোদিনীকে একদিন ভুল বুঝেছিল আসার দুঃখের সেই বিনোদিনীকেই বিহারী সান্ত্বনা দিতে দেখে শ্রদ্ধা করেছে। বিহারী বলেছে- "বিনোদিনীকে ভারী ভুল বুঝিয়াছিলাম সেবায় শান্ত নাই নিঃস্বার্থ সখি প্রেম'। কিন্তু বিহারীর কাছ থেকে আশার প্রতি কৃতজ্ঞতা বোধ বিনোদিনী সইতে পারেনি। কেননা বিনোদিনী, বিহারী কেই ভালোবাসি।

মহেন্দ্র বিনোদিনী কে ভালোবাসতে চেয়েছে, কিন্তু একদিন বিবাহের প্রস্তাব উপেক্ষা করেছে, তাই মহেন্দ্রকে সে আকর্ষণ করলেও ভালোবাসে না। বিহারীর মধ্যে সেই ভালোবাসার স্পর্শ পেয়েছিল তাই সে বিহারী কেই ভালোবাসে। আশাকে দিয়ে যে চিঠি সে মহেন্দ্র কে লিখিয়েছে সেই চিঠি পেয়ে মহেন্দ্র মাতাল হয়ে উঠেছিল। বিনোদিনীকে ভুলবার জন্য মহেন্দ্র পালিয়ে বিনোদিনীর মনের এই ভুল ভেঙ্গে দিতে এবং বিহারীর

অনুরোধে মহেন্দ্র বাড়ি ফিরে এসেছিল। একদিন আসার প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপনের জন্য বিহারীকে ভুল বুঝে, অন্যদিকে বিনোদিনীকে না পাওয়া বেদনা এই দুটি মহেন্দ্র কে পাগল করে তুলেছিল। বিনোদিনী তখন দূরত্ব সৃষ্টি করার জন্য বারাসাতে যাওয়ার জন্য রাজলক্ষ্মীকে অনুরোধ করছে। কিন্তু আসার কাতরতা মহেন্দ্র অনুরোধ উপেক্ষা করে বিনোদিনী যাওয়া হয়নি। তাই সে থাকার বিনিময়ে সে মহেন্দ্রর কাছ থেকে বিয়ের স্বীকৃতি আদায় করে নিয়েছে। বিহারী ও আসার করলেন কামনায় বিনোদিনী উপস্থিতিকে মূল্য দিয়েছি। কিন্তু মহেন্দ্রর মনে তখনও বিষাদের সুর। মহেন্দ্র অন্নপূর্ণার সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য কাশি যায়। আশার প্রতি প্রেম এবং বিনোদিনীর সাহচর্য দুই প্রতিকূল পরিবেশের সঙ্গে তাল মিলাতে না পেরে মহেন্দ্র চলে গিয়েছিল কাশিতে। ইতিপূর্বে সে বিহারীর কাছে স্বীকার করেছে সে যে পাষণ্ড। কাশি বাস মহেন্দ্রর মনে বিনোদিনীর প্রতি আকর্ষণ শেষ করে আশাকে অবলম্বন হিসেবে বেছে নিতে সাহায্য করেছিল।

আশার প্রতি বিনোদিনীর ভালোবাসা, বিহারী বিনোদিনীর প্রতি ধারণা বদলে গিয়েছিল। বিনোদিনীকে মনে মনে শ্রদ্ধা করতে শুরু করেছে। বিনোদিনী ও বিহারীর কাছ থেকে প্রতিব্রতা স্পর্শ পেয়ে ধন্য হয়ে উঠেছিল। মহেন্দ্র কাশি থেকে ফিরে এলে মহেন্দ্রর পরামর্শে ও উৎসাহে আসা যখন কাশিতে চলে গেছে তখন বিনোদিনী মনে মনে আকাঙ্ক্ষিত হয়ে উঠেছে। তার হৃদয়ের দুর্বলতার কথা ভেবেই সে তার ও মহেন্দ্রর মাঝখানে বিহারীর উপস্থিতি প্রত্যাশা করেছে। বিহারী কে বলেছিল-"আমি দেবী নই ঠাকুরপো, শুনিয়া যাও। তুমি চলিয়া গেলে কাহারো ভালো হইবে না। ইহার পরে আমাকে দোষ দিও না"। কাশি বাসে যাওয়ার পর বিনোদিনী মহেন্দ্র সঙ্গে প্রেমের অভিনয় করেছে। সেবা যত্নের দ্বারা মহেন্দ্র হৃদয় জয় করেছে। মহেন্দ্র ও আশাকে ভুলে গিয়ে বিনোদিনীকে পাওয়ার জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠেছে বিনোদিনীর পা জড়িয়ে ধরে তার প্রণয় ভিক্ষা করতেও মহেন্দ্র কুণ্ঠিত হয় নি। কিন্তু বিনোদিনী হৃদয় দিয়ে বিহারীকেই ভালবেসেছে। বিহারী প্রতি বিনোদিনী আকর্ষণ তীব্রতা অনুভব করে মহেন্দ্র বিনোদিনীর প্রতি আরো বেশি ধাবিত হয়েছে। বিনোদিনীও আশাকে দুজনকেই পেতে চেয়েছি। বিনোদিনীর সঙ্গে প্রেমের সম্পর্ক আর আসার সঙ্গে দানপত্রের। মহেন্দ্র জানিনা ভালোবাসা পাওয়ার অধিকার বিনোদিনী নেই। ভালোবাসার খেলা খেলায় বিনোদিনী সাদ মেটাতে চায়। এ কারণে মহেন্দ্রকে সে চিঠিতে জানিয়েছিল-"ভালোবাসায় তৃষ্ণায় আমার হৃদয় হইতে বক্ষ পট লুকাইয়া উঠিয়াছি-সে তৃষ্ণা পূরণ করিবার সম্বল তোমার হাতে নাই, সে আমি বেশ ভালো করিয়া দেখিয়াছি"। মহেন্দ্রকে তাই সে বলেছে-"তুমি আমাকে ত্যাগ কর, আমার পশ্চাতে ফিরিয়েও না; নিলজ্জ হইয়া আমাকে লজ্জা দিওনা।

আমার খেলা শখ মিটিয়ে আছে, এখন ডাক দিলে কিছুতেই আমার সাড়া পাইবে না"। মহেন্দ্রর আর প্রত্যা বর্তনের পথ ছিল না। সে প্রশ্ন করেছে-"এমন খেলা কেন খেলিলে বিনোদ। এখন ইহাকে খেলা বলে মুক্তি পাইবেনা। এখন তোমার আমার একই মৃত্যু"। বিনোদিনী তখন আর মহেন্দ্রকে ভালোবাসেনি। মহেন্দ্রর কাছ থেকে পালিয়ে এসে বিহারীর কাছে আত্মসমর্পণ করে বিহারী সাহায্যে গ্রামের বাড়িতে চলে আসে। কিন্তু মহেন্দ্রর সঙ্গে তার সম্পর্কের অপবাদে চারিদিকে অপমানের হাত থেকে বাঁচবার জন্য সে মহেন্দ্র সঙ্গে চলে এসেছিল পটলডাঙ্গা বাসা বাড়িতে। বিনোদিনী মহেন্দ্রর কাছে আত্মসমর্পণ করেছিল। মহেন্দ্রর সঙ্গে সে পঞ্চমে যাত্রা করেছে মহেন্দ্র কে পাওয়ার জন্য নয়, বিহারীকেই লাভ করার জন্য।

এলাহাবাদের বাড়িতে বিহারীর স্বয়ংকক্ষ সুন্দর করে সাজিয়ে বিনোদিনী বিহারী জন্যই যেন তার প্রেমের অর্ঘ্য নিবেদনে এগিয়ে এসেছিল। কিন্তু সঙ্গে একত্রে অবস্থান, স্বয়ং কক্ষে লুকানো ফুল, ছেড়া মালা দেখে বিহারী ভুল করেছিল বুঝি মহেন্দ্রর প্রতি বিনোদিনীর মিলনের চিহ্ন এসব। কিন্তু বিনোদিনীর পবিত্র প্রেম নিবেদন এবং মহেন্দ্র সঙ্গে সংঘর্ষ এবং পশ্চিম যাত্রার সত্য উদঘাটন এর মধ্য দিয়ে বিহারীর প্রতি বিনোদিনীর প্রেমের প্রকাশ ঘটেছে। বিহারী বিনোদিনীকে বিবাহ করতে চেয়েছিল। বিধবা বিনোদিনী সম্মত দেয়নি। বিবাহ বিহীন কামনা মুক্ত প্রেমের শ্রেষ্ঠতা ঘোষণা করে প্রেমকে বৈরাগ্য।

উপসংহার:-

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখা একটি সামাজিক উপন্যাস 'চোখের বালি'।১৯০১-১৯০২ সালে নবপর্যায়ে বঙ্গদর্শন পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়। ১৯০৩ সালে বই আকারে প্রকাশিত হয়।

উপন্যাসের বিষয় "সমাজ ও যুগ যুগান্তরাগত সংস্কারের সঙ্গে ব্যক্তি জীবনের বিরোধ"। উপন্যাসের সর্বময় কর্ত্রী মা, এক অনভিজ্ঞা বালিকা বধূ, এক বিধবা ও তার প্রতি আকৃষ্ট দুই পুরুষকে কেন্দ্র করে আবিতির্ত হয়েছে। ১৯০৪ সালের অমরেন্দ্রনাথ দত্ত এই উপন্যাসে নাট্যরুপ দেন। অ্যাসেসিয়েট পিকচার্সের প্রযোজনার চোখের বালি অবলম্বনে নির্মিত প্রথম চলচ্চিত্রটি মুক্তি পায়। ২০০৩ সালে বিশিষ্ট পরিচালক ঋতুপর্ণ ঘোষ এই উপন্যাস অবলম্বনে চোখের বালি নামে একটি চলচ্চিত্র নির্মাণ করেছিল। চোখের বালি ইংরেজি দুবার, হিন্দি ও জার্মান ভাষায় অনূদিত হয়।

তথ্যসূত্র:-

১। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর: 'চোখের বালি' বিশ্বভারতী গ্রন্থ বিভাগ

২। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর: 'চোখের বালি' পূর্বক্ত পৃষ্ঠা সংখ্যা-৭৯

৩। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর: 'চোখের বালি' পূর্বক্ত পৃষ্ঠা সংখ্যা-১২৩

৩। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর: 'চোখের বালি' পূর্বক্ত পৃষ্ঠা সংখ্যা-১২৭

৪। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর: 'চোখের বালি' পূর্বক্ত পৃষ্ঠা সংখ্যা-১৫১

৫। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর: 'চোখের বালি' পূর্বক্ত পৃষ্ঠা সংখ্যা-১৭১

৬। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর: 'চোখের বালি' পূর্বক্ত পৃষ্ঠা সংখ্যা-১৭৮

সহায়কগ্রন্থ:-

প্রকাশক: ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয় নবপর্যায় বঙ্গদর্শন পত্রিকায়।

বই: মজুমদার লাইব্রেরী, কলকাতা (১৯০৩) ইন্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস, কলকাতা (১৯১০) বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ, কলকাতা (২০০১ পর্যন্ত শতাধিকারী)।